ধারাবাহিক রচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের ইতিবৃত্ত

স্বামী চেতনানন্দ

(মার্চ-এপ্রিল ২০২২ সংখ্যার পর)

জন্মোৎসব : তৃতীয় বর্ষ—১৮৮৩

সে-বছর ঠাকুরের জন্মতিথি পড়েছিল রবিবার, ১১ মার্চ ১৮৮৩। রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, ঠাকুরের সব ভক্তেরা মিলিত হয়ে একটি জন্মমহোৎসব কমিটি গঠিত করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন—সুরেন্দ্র মিত্র, বলরাম বসু, কেদার চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মুস্তাফি, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অতুলচন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন মিত্র, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল ঘোষ, কালীপদ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ঠাকুরের জন্মোৎসব কীভাবে পালন করা হত সে-বিষয়ে রামচন্দ্র দত্ত স্মৃতিচারণ করেছেন :

''জন্মোৎসবের দিন পরমহংসদেবের ভক্ত ও অন্যান্য যে-কোন ব্যক্তি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হইত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ব্যতীত কত রকমের ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রাতঃকাল হইতে ভক্তদিগের সমাগম আরম্ভ হইত। ত্রৈলোক্য বাবু এবং তাঁহার কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা (না করাই আশ্চর্য্যের বিষয়) করিতেন। যে সকল ব্যক্তিরা তথায় গমন করিতেন, তাঁহারা এই উপলক্ষ ব্যতীত কস্মিন্ কালে সে প্রদেশে যাইতেন কি না সন্দেহ। দশটার পরে পরমহংসদেব স্নানাদি করিতেন, পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইত। এই কীর্ত্তনে যে কি আনন্দ হইত, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি যদি প্রভুর নিকট হইতে কেহ লাভ করেন, তিনি ব্যতীত আর কাহারও নাই; এ ক্ষেত্রে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব, যদি তদ্দ্বারা পাঠক-পাঠিকারা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইতে পারেন। কীর্ত্তনের রস আঁখরে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরমহংসদেব মধ্যে মধ্যে আঁখর দিয়া গানটীকে মাতাইয়া আপনি মাতিয়া উঠিতেন। তিনি মাতিলে আর কাহার রক্ষা থাকিত না। ভক্তেরাও বিহ্বল হইতেন। এই মাতান ভাবটীর বাস্তবিক সংক্রামকতাশক্তি ছিল। একজনের হইলে আর একজনকে আক্রমণ করিবেই ফলে সেই স্থানে উপস্থিত ব্যক্তিরা কাষ্ঠ-পুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিত।

''পরমহংসদেবের এ অবস্থায় জ্ঞান থাকিত না, তাহা স্থানান্তরেও বলা গিয়াছে। এই সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষ ভক্তেরা অপেক্ষা করিতেন। সেই সময় তাঁহাকে মনের সাধে সাজানো হইত। জনৈক ভক্ত তাঁহার বস্ত্রখানি চাঁপা ফুলের রং করিয়া দিতেন। আহা! সেই বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিলে

তাঁহার কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বাহির হইত! গৌরী মা পুষ্পের মালা ও চন্দন আনিয়া দিতেন। যখন সেই মালা গলদেশে শোভা পাইত, যখন শ্বেত চন্দনের বিন্দু সকল চরণ এবং ললাটে প্রকাশিত হইত, তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া নয়ন এবং মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। আহা! সে রূপের তুলনা কি আছে? সে রূপ উপমাবিরহিত। সে রূপে যে নয়ন একবার ধাবিত হইয়াছে, সে আর প্রত্যাগমন করিতে পারে নাই। যেন রূপের জালে নয়ন-বিহঙ্গ আবদ্ধ হইয়া পড়িত। সে রূপ দেখিলে, আর অপরূপ বলিয়া জগতে দ্বিতীয় বস্তু স্বীকার করা যায় না। তখন মনে হইত, দেখিবার বস্তু বুঝি এত দিনের পর দেখা গেল। যাহা আমরা দেখি, সুন্দর মনোহর বলিয়া দেখি, তাহা সে রূপের নিকট কি সুন্দর বা মনোহর? তুলনা করিব কি? সে রূপ অনুপমেয়। চাঁদের তুলনা চাঁদ, সূর্য্যের তুলনা সূর্য্য, স্বর্ণের তুলনা স্বর্ণ, তেমনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সে রূপের তুলনা তাঁহারই রূপ—তাঁহার তুলনা তিনিই। রূপ দেখিয়া মন ভুলিল, আপনাকে আপনি ভুল হইল, সকলে রামকৃষ্ণময় হইয়া পড়িল। জয়ধ্বনিতে দিক্ কম্পিত হইতে লাগিল, প্রাণের উৎসাহসূচক ভাব যেন হৃদয় ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। কেহ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, কেহ করতালি দিয়া, কেহ ত্রিভঙ্গ ঠামে এবং লম্ফে ঝম্ফে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে কেহ প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন, কেহ ভক্তের গায় ঢলিয়া পড়িলেন, কেহ আনন্দে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, কেহ হাসিতে হাসিতে যেন শ্বাসবায়ু পর্য্যন্ত রোধ করিয়া ফেলিলেন এবং কেহ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ক্রমে সকলে অর্দ্ধ মৃতপ্রায় হইয়া আসিলেন। আর বাক্য সরে না, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসে কাশি আসিয়া স্বরভঙ্গ করিতে লাগিল, সকলে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইল, খুলির হস্ত ফুলিয়া উঠিল, সুতরাং সঙ্কীর্ত্তনের বিরাম হইল। শান্তি শান্তি প্রশান্তি আসিয়া সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

"পরমহংসদেব ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। অমনি গলার মালা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন, বস্ত্রান্তর্ভাগের দ্বারা ললাটের চন্দন মুছিয়া ফেলিলেন, কিন্তু চরণের চন্দন কখনও মুছিতে পারিতেন না। ঠাকুর, ভক্তদিগের নিকট আপনার চতুরালি চলিতে পারে না। স্বচ্ছন্দে মালা ছিঁড়িলেন, কপালের চন্দন মুছিলেন; এইবার চরণের চন্দন মুছিয়া ফেলুন। অপেক্ষা কিসের? উহাতেও ত রজোগুণের প্রকাশ পাইতেছে; লোক দেখিতে পাইতেছে যে, ভক্তেরা পূজা করিয়াছে, মুছিয়া ফেলুন—রসিক ভক্তদিগের মনে ইত্যাকার আনন্দোচ্ছ্বাস হইতে লাগিল। তিনি চরণের চন্দন মুছিতে পারিলেন না। পারিবেন কেন? চরণ তাঁহার নয়। তিনি যাহাকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অধিকার কি? ভক্তেরা চরণ পাইয়াছে, সে চরণ তাহাদের হৃদয়ের ধন, সুতরাং তাহার শোভা বিনষ্ট করিতে পারিলেন না।

"তিনি তদনন্তর ভক্তদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিয়া অশেষ প্রীতি লাভ করিতেন, কিন্তু এরূপ স্থানে তিনি বর্ণানুরূপ ব্যবস্থা করিতে কহিতেন। যে সকল ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইত, তাহার অগ্রভাগ কেহ পাইত না অথবা কোন দেবদেবীকে নিবেদন করিয়াও দেওয়া হইত না। সমুদায় দ্রব্যগুলি পরমহংসদেবের ঘরে একত্র করিয়া তাঁহাকে দেখান হইত এবং সমস্ত দ্রব্যের অগ্রভাগ তাঁহাকেই প্রদান করা হউক। ভক্তেরা এই প্রকার ভোগের ব্যবস্থা করিতেন।"[৫]

১৮৮৩-এর তৃতীয় জন্মোৎসবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন লাটু মহারাজ :

"সেদিন ঠাকুর হামায় গঙ্গা থেকে জল তুলে আনতে বললেন। মাত্র এক কলসী জলে তিনি আস্নান করলেন। আস্নান কোরে তিনি মায়ের মন্দিরে গেলেন। হামাদের তখন রান্নার জোগাড়

দিতে হয়েছিলো। প্রায় ১০০।১৫০ লোক খেয়েছিলো। সেদিন কোন্নগর থেকে মনোমোহন বাবু কীর্ত্তনের দল এনেছিলেন। তাদের সাথে ঠাকুর খুব কীর্ত্তন কোরেছিলেন। হামাদেরও তিনি যোগ দিতে বলেছিলেন। সেবার পঞ্চবটীতে গান হয়েছিলো। সেদিন ঠাকুর বলেছিলেন—তিনি শুধু সন্ন্যাসী নন, তিনি সন্ন্যাসীর রাজা। সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর যা বেঁচেছিলো সব গরীবদের দেওয়া হোলো।"[৬]

শ্রীম কথামৃতে এই জন্মোৎসবের বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। আমরা কয়েকটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় (highlights) উল্লেখ করব। অবতারের জন্মদিন লক্ষ করে শ্রীম একটি অপূর্ব পরিবেশ পরিবেশন করেছেন : ''প্রভাত হইতে ভক্তেরা একে একে আসিয়া জুটিতেছেন। সম্মুখে মা ভবতারিণীর মন্দির। মঙ্গলারতির পরই প্রভাতী রাগে নহবতখানায় মধুর তানে রোশনচৌকি বাজিতেছে। একে বসন্তকাল, বৃক্ষলতা সকলই নূতন বেশ পরিধান করিয়াছে; তাহাতে ভক্তহৃদয় ঠাকুরের জন্মদিন স্মরণ করিয়া নৃত্য করিতেছে। চতুর্দিকে আনন্দের সমীরণ বহিতেছে।"[৭]

শ্রীরামকৃষ্ণ : ''আজ কত আনন্দ হবে। কিন্তু যে শালারা হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্য-গীত করতে পারবে না, তাদের কোন কালে হবে না। ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কি, ভয় কি?"[৮]

ঠাকুরকে প্রণাম করে কালীকৃষ্ণ বিদায় নিলে, তিনি আক্ষেপ করে বললেন, ''ওর কপালে নাই। আজ হরিনামে কত আনন্দ হবে দেখত? ওর কপালে নাই!"

অবতারের জন্মদিনে দিব্যানন্দের ফোয়ারা বইতে থাকে। এই আনন্দের অংশ মানুষকে দেওয়ার জন্য ঠাকুর সদা চেষ্টা করতেন।

শরীর বিশেষ ভাল না থাকায় ঠাকুর বারান্দায় গঙ্গাজলে স্নান করে নব পীতাম্বর বস্ত্র পরিধান করে কালীমন্দিরে গিয়ে জগন্মাতাকে প্রণাম করে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। তারপর কৃষ্ণমন্দিরে প্রণাম করে সদাশিবের উদ্দেশে প্রণাম করে ঘরে ফিরলেন।

তারপর ভগবৎপ্রসঙ্গ করতে করতে তিনি সমাধিস্থ হলেন। সমাধিভঙ্গের পর ভক্তদের বললেন, ''অবতার যখন আসে, সাধারণ লোকে জানতে পারে না—গোপনে আসে।"[৯]

কোন্নগরের ভক্তেরা খোল করতাল নিয়ে কীর্তন শুরু করলেন উত্তরপূর্ব বারান্দায়। ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হয়ে তাদের সঙ্গে নৃত্য ও কীর্তন করবার কালে সমাধিস্থ হলেন। তারপর সমাধিভঙ্গের পর আহার করলেন। ঘরে লোকের ভিড়। এক বৈষ্ণব গোস্বামীর সঙ্গে নাম-মাহাত্ম্য নিয়ে ঠাকুর সুন্দর উপদেশ দিলেন।

বিকেলে পঞ্চবটীতে নাম সংকীর্তন করে ভক্তদের আনন্দসাগরে ভাসালেন। ঘরে ফেরার পথে বকুলতলায় মন্দিরের মালিক ত্রৈলোক্যের সঙ্গে দেখা হলে বললেন, ''পঞ্চবটীতে ওরা গান গাচ্চে। চল না একবার—"

ত্রৈলোক্য : ''আমি গিয়ে কি করব?"[১০]

আমাদের মধ্যে অনেকেই কালীকৃষ্ণ ও ত্রৈলোক্য-দলের লোক। অবতারের আমন্ত্রণে সাড়া দিই না।

জন্মোৎসব : চতুর্থ বর্ষ—১৮৮৪

এ-বছর ঠাকুরের জন্মতিথি পড়েছিল বৃহস্পতিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪। ওইকালে ঠাকুর ভাবে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে যান এবং পড়ে গিয়ে হাত ভাঙার ফলে তাঁর জন্মতিথি পালিত হয় রবিবার, ২৫ মে। লাটু মহারাজ বলেছিলেন : ''উনার হাত ভেঙ্গে যাওয়ায় সেবারের জন্মোৎসব পিছিয়ে গেলো। ফাল্গুন মাসে হোলো না। হাত ভাল হলে তবে সেবার জন্মোৎসব হয়েছিলো।"[১১]

১৮৮৪ থেকে ঠাকুরের জন্মতিথি ও জন্মোৎসব পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া শুরু হল।

রবিবার, ২৫ মে ১৮৮৪। কথামৃতে শ্রীমর বর্ণনা :

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে পঞ্চবটীর পুরাতন বটবৃক্ষের চাতালে উপবিষ্ট। বেলা ১টা। ঠাকুর বিজয়, কেদার, সুরেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করলেন ও কয়েকটা গান গাইলেন। ত্যাগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বললেন, ''বন্ধনের কারণ কামিনী-কাঞ্চন।... কামিনী-কাঞ্চনই ঈশ্বরকে দেখতে দেয় না।''[১২]

চৈতন্যদেব দোরে দোরে হরিনাম বিলিয়েছেন। ঠাকুর তেমনি কলকাতায় ভক্তদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ভগবৎপ্রসঙ্গ করেছেন এবং নৃত্য ও গীত দ্বারা তাঁদের আনন্দ বর্ধন করেছেন। গাড়িভাড়ার জন্য অনেক সময় তাঁকে অসুবিধায় পড়তে হত। তিনি বলেছেন, ''সকলকেই দেখি, মেয়েমানুষের বশ। কাপ্তেনের বাড়ি গিছলাম;—তার বাড়ি হয়ে রামের বাড়ি যাব। তাই কাপ্তেনকে বললাম, 'গাড়িভাড়া দাও।' কাপ্তেন তার মাগ্‌কে বললে। সে মাগও তেমনি—'ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া' করতে লাগল। শেষে কাপ্তেন বললে যে, ওরাই (রামেরা) দেবে। গীতা, ভাগবত, বেদান্ত সব ওর ভিতরে!''[১৩]

সকলে হাসতে লাগল। আমরা লক্ষ করি স্বয়ং অবতারেরও problem আছে। ঠাকুর কিন্তু তা হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে হালকা করে দিতেন। বাইবেলেও আছে অবতাররা ভক্তদের কাছে যান : ''Behold, I stand at the door and knock : if any man hear my voice and open the door, I will come into him, and will sup with him, and he met me.'' (Revelation, 3:20)

পঞ্চবটীতলায় প্রসিদ্ধ কীর্তনী সহচরী 'গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস' গান শুরু করলেন। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি আসায় সকলে ঠাকুরের ঘরে কীর্তনের ব্যবস্থা করলেন। সহচরীর গান শুনে ঠাকুর নৃত্যের সঙ্গে গানের আখর দিতে দিতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। তারপর প্রকৃতিস্থ হয়ে ঠাকুর সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম বললেন : সাধুসন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য ও লোকশিক্ষার জন্য কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করবে।

জন্মোৎসব : পঞ্চম বর্ষ—১৮৮৫

ওই বছর ঠাকুরের জন্মতিথি ছিল সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি এবং জন্মোৎসব পালিত হয় রবিবার, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫। এ বছর খুব ঘটা করে উৎসব হয়েছিল। উৎসবের পূর্বদিন ঠাকুর বৈকুণ্ঠ সান্যালকে বললেন, ''হ্যাঁ গা, এরা (ভক্তেরা) কাল আমার জন্মোৎসব করবে; তুমি আসবে না?''[১৪] পরদিন বৈকুণ্ঠ এসে পুণ্যদিন ভেবে উপবাসী থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অন্তর্যামী ঠাকুর নিজে প্রসাদ গ্রহণ করে বৈকুণ্ঠকে বললেন, ''তোর ভিতর আমি রয়েছি, তুই না খেলে আমার যে কষ্ট হবে''—বলে নিজের প্রসাদের অংশ তাঁকে খেতে দিলেন। ঠাকুর উপবাস পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন—ভক্তেরা খাক ও আনন্দ করুক। যিশুও তাই বলেছিলেন, ''Can the children of the bride-chamber fast, while the bridegroom is with them?''[১৫]

এই পঞ্চম জন্মোৎসবের সংবাদ শ্রীম বিস্তারিতভাবে কথামৃতে লিপিবদ্ধ করেছেন। সকাল থেকে প্রচুর ভিড়। প্রসিদ্ধ কীর্তনিয়া নরোত্তম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা গাইছেন এবং খোলবাদক গোষ্ঠ বাজাচ্ছেন। কীর্তন শুনতে শুনতে ভাবস্থ হয়ে ঠাকুর নরেন্দ্রকে স্পর্শ করলেন। বেলা এগারোটার সময় রাম প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরকে নব পীতবস্ত্র পরাতে গেলে ঠাকুর একজন ইংরেজি পড়া লোককে দেখিয়ে বললেন, ''না, না উনি কি

বলবেন।" ভক্তেরা জিদ করাতে ঠাকুর বললেন, ''তোমরা বলছ—পরি।" ঠাকুর show পছন্দ করতেন না। সেজন্য সাদা কাপড়ই পরতেন। তবে বিশেষ দিনে ভক্তদের অনুরোধে গেরুয়া কাপড় পরেছেন। রাম দত্তের স্ত্রী কৃষ্ণপ্রেয়সী দেবী ঠাকুরের জন্য কাপড় রং করতেন। অক্ষয় সেন রামকৃষ্ণপুঁথিতে লিখেছেন : ''অতি মিহি দেশী ধূতি নয় হস্ত প্রায়। /আরক্ত বরণ ঘোর লাল পাড় তায়॥ /সুন্দর চাঁপার বর্ণে ছোবান সেখানি। ছোবাইয়া দিয়াছেন রামের ঘরণী॥"[১৬]

এই উৎসবে অক্ষয় সেন ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি আরও লিখেছেন, ''মনোহর ফুলহার পরাইল গলে। /শ্বেত চন্দনের বিন্দু ললাটে কপালে॥... /চরণে চন্দন-রেখা কিবা শোভমান। নয়নের মনোলোভা শোভার নিদান॥ কুসুমের হার আর চন্দন ঘসিয়ে। /গৌর-মা আনিয়াছিল প্রভুর লাগিয়ে॥ /রূপের শোভার প্রভু একে তো আপনি। তাহার উপরে ভক্তে করিলা সাজনি।"[১৭]

তারপর পুঁথিতে অক্ষয় সেন কীর্তনে ঠাকুরের নৃত্য ও গীত বিশদভাবে লিখেছেন। ক্রমে তাঁর ভাব প্রশমিত হল। ভক্ত ও ভগবানের লীলা বর্ণনায় ''প্রভুর অবস্থা কিবা শুনহ এখন।/ শ্রীঅঙ্গেতে সমুদিত বাহ্যিক চেতন॥ শ্রীপ্রভু গলার মালা ধরিয়া দুহাতে।/ ছিন্ন ছিন্ন করি তায় ফেলিলা তফাতে॥ মুছিলা বসন দিয়া চন্দনের রেখা।/ ললাটে কপালদেশে যত ছিল লেখা॥ কিন্তু প্রভু মুছিবারে না পাইলা লাগ।/ চরণযুগলে যত চন্দনের দাগ॥ শুন তবে বলি কথা কারণ তাহার।/ শ্রীপদে প্রভুর নাই কোন অধিকার॥ শ্রীঅঙ্গের সঙ্গে রহে শ্রীপ্রভুর সনে।/ চিরকাল ভক্তদের তাঁর মাত্র নামে॥"[১৮]

তারপর প্রত্যক্ষদর্শী বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল রামকৃষ্ণ-লীলামৃতে লিখেছেন : ''বেলা প্রায় দুইটা, এইবার পঙ্‌ক্তি-ভোজের উদ্‌যোগ। চিড়া, দহি ও চিনি পরিবেশন হইতেছে দেখিয়া, ঠাকুর বালকের মতো বলিলেন, ''রামের কি ছোট নজর, আমার জন্মোৎসবে কিনা চিড়ের ব্যবস্থা করল।"[১৯] ভক্তদের আনন্দ-ভোজন করাবার ইচ্ছায় ঠাকুর গান ধরলেন, ''মোণ্ডা খাজা খুরমা গজা মোদক-বিপণি-শোভনম্।" সবাই তখন হাসতে লাগল। তারপর দই পরিবেশন দেখে ঠাকুর হাত তুলে গাইলেন, ''দে দৈ দে দৈ আমার পাতে, ওরে ব্যাটা হাঁড়িহাতে। ওরা কি তোর বাবা খুড়ো, (তাই) ওদের পাতে ঢালছিস হাঁড়ি হাঁড়ি॥"[২০] এভাবে নিজের জন্মোৎসবকে জমিয়ে তুললেন।

রাম দত্ত ছিলেন ঠাকুরের জন্মোৎসব কমিটির ম্যানেজার। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব ভাবাবলম্বী, পাণিহাটিতে চিড়ার মহোৎসব দেখেছেন। চৈতন্যের শিষ্য নিত্যানন্দ রঘুনাথ গোস্বামীকে বলেছিলেন, ''তুমি চোর তুমি এই উৎসবে ভক্তি চুরি করতে আস। আমি তোমাকে শাস্তি দেব।" রঘুনাথ সানন্দে শাস্তি চাইলে, নিত্যানন্দ বলেন, ''তুমি এখানকার সকলকে চিড়ার মালসা ভোগ খাওয়াও।" তাতে থাকত চিড়ে, মুড়কি, দই, চিনি, কলা, আম, সন্দেশ প্রভৃতি। তা একটা মাটির মালসা ভরে সবাইকে ওই উপাদেয় প্রসাদ দেওয়া হত। মনে হয় রাম পাণিহাটির চিড়াভোগ অনুসরণ করে ঠাকুরের জন্মোৎসবের menu করেছিলেন, পরে তিনি বুঝলেন যে ঠাকুর চিড়াভোগ অনুমোদন করেননি।

ঠাকুর খিচুড়ি পছন্দ করতেন। যেদিন তাঁর শরীর যায় তিনি বলেছিলেন, ''ভেতরে এত ক্ষিধে যে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি খাই; কিন্তু মহামায়া কিছুই খেতে দিচ্ছেন না।"[২১] পরবর্তী কালে শ্রীমা যখন কামারপুকুরে একাকী ছিলেন, তখন ঠাকুর তাঁকে দর্শন দিয়ে বলতেন, ''খিচুড়ি খাওয়াও।"[২২] মা খিচুড়ি রেঁধে রঘুবীরকে নিবেদনকালে ভাবে ঠাকুরকে খাওয়াতেন। প্রত্যেক অবতারের প্রিয় ভোজ্য বস্তু ছিল। এ-প্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠনাথ লীলামৃতে লিখেছেন : অযোধ্যানাথ রামচন্দ্রের রাজভোগ,

কৃষ্ণের ক্ষীরসর, বুদ্ধের ফাণিত (একপ্রকার মিষ্টান্ন), চৈতন্যের মালসা ভোগ (মৃৎপাত্র ভর্তি চিড়া, মুড়কি, দধি), শ্রীরামকৃষ্ণের খিচুড়ি।[২৩]

এই প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা মনে পড়ছে। এক নবীন সন্ন্যাসী বেলুড় মঠে ঠাকুরের উৎসবে খিচুড়ি পরিবেশন করছেন। এক প্রবীণ সন্ন্যাসী তাঁকে বললেন, ''জান, বেলুড় মঠের প্রসাদি খিচুড়ির শক্তি ও মহিমা? শোনো, তোমাকে একটা ঘটনা বলি। বেলুড় মঠে ভক্তেরা এলে বাবুরাম মহারাজ খুব যত্ন করে প্রসাদ খাওয়াতেন। এক বছর মঠে বেশি খরচের জন্য টাকার ঘাটতি (deficit) হয়। রাজা মহারাজ বাবুরাম মহারাজকে তা বলতে বাবুরাম মহারাজ বলেন যে তিনি ভিক্ষা করে ওই ঘাটতি পূরণ করে দেবেন। এ-সংবাদ উদ্বোধনে পৌঁছলে ব্রহ্মচারী গণেন (উদ্বোধনের প্রকাশন বিভাগের ম্যানেজার) বলেন : 'বাবুরাম মহারাজ বেলুড় মঠে হোটেল খুলে দিয়েছেন। তিনি কেবল ভক্তদের প্রসাদ খাওয়াতে ব্যস্ত।' বাবুরাম মহারাজ তাঁর মন্তব্য শুনে বললেন, 'গণেন ছেলেমানুষ। ও কী জানে? আমি ভক্তদের প্রসাদ খাওয়াই—ফলে তাদের ভক্তি হয়। তারপর ওই ভক্তির জোরে তারা উদ্বোধনে গিয়ে বই কেনে। ওদের বই বিক্রির পিছনে রয়েছে ঠাকুরের প্রসাদ।' দেখো, বেলুড় মঠের খিচুড়ি প্রসাদের শক্তি!''

ঠাকুরের দেবভাব ও মানুষভাব যুগপৎ কীভাবে প্রকাশ পেত তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। নরেন্দ্রের গান—''নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি''—শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। সমাধি-ভঙ্গের পর খেতে বসলেন, কিন্তু ভাবে খেতে পারছেন না। ভবনাথকে বলছেন, ''তুই দে খাইয়ে।'' একটু পরেই ভক্তদের সাদর সম্ভাষণ করছেন। সিঁথির মহেন্দ্র কবিরাজকে দেখে সহাস্যে রাখালকে বলেছেন, ''হাতটা দেখিয়ে নে।'' গিরিশকে দেখে রামলালকে বলছেন, ''গিরিশ ঘোষের সঙ্গে ভাব কর, তাহলে থিয়েটার দেখতে পাবি।'' অর্থকষ্টে প্রপীড়িত নরেন্দ্রকে বলছেন, ''তুই কি হাজরার কাছে বসেছিলি? তুই বিদেশিনী সে বিরহিণী! হাজরারও দেড় হাজার টাকার দরকার।''[২৪] *ক্রমশ*

তথ্যসূত্র

৫। রামচন্দ্র দত্ত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৩৫৭) পৃঃ ১৫৪-৫৭

৬। চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, *শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬০) পৃঃ ১২৬-২৭ [এরপর, *লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা*]

৭। শ্রীম-কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), অখণ্ড, পৃঃ ১৪৫ [এরপর, *কথামৃত*]

৮। তদেব

৯। তদেব, পৃঃ ১৪৯

১০। তদেব, পৃঃ ১৫৫

১১। *লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা*, পৃঃ ১২৪

১২। *কথামৃত*, খণ্ড ১, পৃঃ ৪৪০

১৩। তদেব, পৃঃ ৪৪০-৪১

১৪। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত* (নবপত্র প্রকাশন : কলকাতা, ১৩৯০), পৃঃ ৬৫

১৫। Bible, Mark, 2:19

১৬। অক্ষয় কুমার সেন, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯২), পৃঃ ৫২১

১৭। তদেব

১৮। তদেব

১৯। *লীলামৃত*, পৃঃ ৬৮

২০। তদেব

২১। তদেব, পৃঃ ১১৯

২২। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২), পৃঃ ১২১

২৩। *দ্রঃ লীলামৃত*, পৃঃ ১১৯

২৪। *কথামৃত*, পৃঃ ৭৩১